বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবীপরিষদের মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

তৃতীয় বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১০ই আগষ্ট ১৯৭৪ শনিবার ২৪শে শ্রাবণ ১৩৮১ প্রতি সংখ্যা ২৫ প.

লক্ষ লক্ষ লোক যাহা ভোগ করিতে পারে না,
তাহা বর্জনের দৃঢ় অঙ্গীকৃতিই শ্রেষ্ঠত্বমণি যাগ।

—গান্ধীজী

সম্পাদকীয়

স্মৃতির বিড়ম্বনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বর্ত্তমান দুনীয়ার সর্ব্বাপেক্ষা সম্পদশালী ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাধিকারী রাষ্ট্র প্রধান। তাঁহার ক্ষমতা সত্যই তুলনাহীন, দায়িত্বও তদনুরূপ অতুলনীয়। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অনেকে সেই জন্য ডিক্টেটর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। কিন্তু, প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থে যাহাদিগকে সুনির্দিষ্ট ভাবে ডিক্টেটর বলিয়া চিহ্নিত করা হয় তাহাদের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতিগত ও গুণগত পার্থক্য অসীম। উভয়ের ক্ষমতার উৎস স্বতন্ত্র; ক্ষমতাধিকারের সর্ত্ত ও সীমানা মূলতঃ বিভিন্ন।

জনতার নির্ব্বাচিত প্রতিনীধি বলিতে যাহা বুঝা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে তাহা বস্তুতঃই সর্ব্বাংশে প্রযুজ্য। তাঁহাকে শুধুই যে প্রতিটি নাগরিকের প্রত্যক্ষ সমর্থনের ফলে পদাধিকার লাভ করিতে হয় তাহাই নয়, প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হইতে হইলে যে ধরণের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও ব্যাপক কর্ম্মকাণ্ডের মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাকে মনোনয়ন লাভ করিতে হয় সারা পৃথিবীর সংবিধানিক ব্যবস্থায় তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। এতদ্ভিন্ন, অপরাপর সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের এবং নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতার অধিকার স্বীকৃত। ঐতিহাসিক কারণেই, আমেরিকায় বহুকাল হইতে প্রধানতঃ মাত্র দুইটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদাধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বীতা সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ফলতঃ কাহাকেও প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইতে হইলে তাহাকে মুখোমুখী দ্বৈরথ প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিজয়ী হইতে হয়। সুতরাং এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠতার ক্ষেত্রে হিসাবের জটিলতা বা কারচুপি থাকিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। এই সকল সুপরিকল্পিত গণতান্ত্রিক নীতি ও বিধিব্যবস্থাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে ক্ষমতাধিকারের উৎস। ভিন্ন কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই হউক অথবা, রাষ্ট্রপরিচালনা কিম্বা আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী সুদৃঢ় করিবার জন্য অর্থ বরাদ্দই হউক মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কোন কারণেই রাষ্ট্রীয় সংস্থা সমূহের অনুমোদন লাভের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল হইতে হয় না। অতএব নিজের দলের সংখ্যা লঘিষ্টতা তাঁহার ক্ষমতাকে দুর্ব্বল বা সীমিত করতে পারে না। তিনি জনতার সার্ব্বিক সমর্থন পুষ্ট রাষ্ট্র নেতা, সুতরাং দলীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা তাঁহার নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক নয়। দলীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা স্বপক্ষে থাকিলে রাষ্ট্রপরিচালনায় অথবা কোন আন্তর্জ্জাতিক জরুরী সমস্যা সমাধানে তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের উপর নির্ভর করিতে হয় না—এই মাত্র।

অপর পক্ষে, ডিক্টেটরকে বলা যায় স্বয়ংসিদ্ধ রাষ্ট্রনেতা। কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রবণতা অথবা রাষ্ট্রের সশস্ত্র সৈন্যদলের পক্ষপাতীত্ব মূলক সমর্থনই তাঁহার ক্ষমতার উৎস।

ডিক্টেটর ক্ষমতায় ভোট গ্রহণ করিয়া ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি তাঁহার নিজের দলীয় এবং/অথবা সশস্ত্র সৈন্যদলের প্রাবল্যকে বাহন করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। ডিক্টেটর শাসিত রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বীতার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বহুদলীয় রাজনীতি চর্চ্চা সেখানে আইন বলে নিষিদ্ধই শুধু নয়, বস্তুতঃ সেরূপ চেষ্টা সেখানে গুরুতর রাষ্ট্র বিরোধী অপরাধ বলিয়া গণ্য।

পদাধিকার এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ক্ষমতা লাভ সম্পর্কে ডিক্টেটর ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের মধ্যে যে বৈশিষ্টপূর্ণ পার্থক্য রহিয়াছে তাহার এতদধিক বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখানে আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন। কারণ আমরা আলোচনা করিতে চাহিতেছি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে কেন্দ্র করিয়া সেই দেশে যে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহারই মাধ্যমে তাহা বিশ্বের রাষ্ট্রীয় আদর্শের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি যে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে সেই সম্পর্কে একশত বছরের কিছু বেশী কাল পূর্বে আমেরিকার তৎকালিন প্রেসিডেন্টকে কেন্দ্র করিয়া অনুরূপ একটি রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছিল। একটি মাত্র ভোটের আনুকূল্যে সেবারের প্রেসিডেন্ট সেই অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছিলেন। পরবর্তী কালের রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্টের বিরোধী দলের কর্মপ্রণালী ও উৎসাহ উদ্দীপনা সে সময় এতই অতিরিক্ত সন্দেহ সংকুল এবং সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল যে সমগ্র ব্যাপারটি বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি গোষ্ঠির ষড়যন্ত্র মূলক চক্রান্ত হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনেকেরই মনে হইয়াছিল। জনমনের অথবা চরম পরাক্ষার বিচারকগণের এই বিশ্লেষণাত্মক আনুকূল্যই তৎকালিন মার্কিন প্রেসিডেন্টের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ঘিরিয়া যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা মনযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, আমেরিকার ডেমোক্রাটিক দল রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রতিটি স্তরে প্রবল সংখ্যা গরিষ্ঠতার অধিকারী হওয়া সত্বেও দৃশ্যতঃ তাহারা নিজেদের যথা নির্দ্দিষ্ট কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া যাওয়া ভিন্ন অতিরিক্ত কোন প্রবণতা প্রকাশ করিতেছেন না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রেসিডেন্ট নিক্সন রিপাব্লিকান দলের মনোনীত প্রার্থী হিসাবেই পদাধিকার লাভ করিয়াছিলেন এবং এই রিপাব্লিকান দল রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রতিটি স্তরেই সংখ্যালঘিষ্ট দল। অতএব সকল দিক বিবেচনা করিয়া ইহাই আশা করা যায় যে, এবারের বিচার নিখুঁত হইবে এবং সন্দেহোত্তীর্ণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে।

সমগ্র মামলাটির উৎপত্তি কাল দুই বৎসরেরও অধিক—বস্তুতঃ প্রেসিডেন্ট নিক্সন দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ধূমায়িত হইতেছিল। সন্দেহের এই ধূম্রজাল সৃষ্টি করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল আমেরিকার অসম সাহসিক ও অক্লান্ত উদ্যোগী সাংবাদিক গোষ্ঠী। যে দেশে দূর পাল্লার পিস্তলের গুলী বর্ষণ করিয়া দেশের সুরক্ষিত রাষ্ট্র-প্রধানকে হত্যা করা হইয়াছিল সামান্য কয়েক বৎসর পূর্বেই, সে দেশের কোন রক্ষক বিহীন, সাধারণ নাগরিকের পর্য্যায়ভুক্ত সাংবাদিকের পক্ষে অপরিমিত ক্ষমতা ও অর্থ সম্বলতার অধিকারী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করা যে কি পরিমাণ আত্ম বিশ্বাস ও সৎসাহসের

দৃষ্টান্ত তাহা সহজেই অনুমেয়। যতদূর মনে পড়িতেছে, প্রথমদিকে ভিয়েৎনাম ও কাম্বোডিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে কোন কোন সাংবাদিক সংস্থা এমন কতগুলি উচ্চ পর্যায়ের সংবাদ ফাঁস করিয়া দিতে থাকে যাহাতে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ জনমনে সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছিল। অপরপক্ষে সংবাদগুলি ছিল এমনই ধরণের যাহা প্রেসিডেন্টের খাস দপ্তর অথবা পেন্টাগণের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ ভিন্ন আর কাহারও জানিবার কথা নয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হইয়া উঠিতেছিল এই যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় উচ্চতম মহল হইতেও এই সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিবার চেষ্টাতো দূরের কথা বস্তুতঃ তাহারা নিজেদের দপ্তরের দুর্বলতা ও অবিশ্বস্ততা সম্পর্কেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে ছিলেন এই সকল ঘটনা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট নিক্সন যখন অভূতপূর্ব্ব ভোটাধিক্যে দ্বিতীয় বারের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নির্ব্বাচিত হইলেন তখন, স্বভাবতঃই, সকলের মনে হইয়াছিল যে, অতঃপর তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ উত্থাপন করিতে অগ্রসর হইবে না। কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ ও আদর্শনিষ্ঠ দুরন্ত সংসাহসী মার্কিন সাংবাদিকগণ পরাজয় মানিল না—সত্য সন্ধানে নিরস্ত হইল না। বলে, সম্প্রতি ব্যাপক প্রচারিত ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারির আত্মপ্রকাশ। শুধুই সংসাহস নয়, শুধুই উদ্যম নিষ্ঠা নয়, বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ, তথ্য ও অভিমত প্রকাশের সাংবাদিকদের যে স্বাধীনতা দিয়াছে তাহার প্রতি অবিচলিত আস্থা রাখিয়া সেই স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে ইহা এমন একটি দৃষ্টান্ত যাহার স্মরণে ও মননে যে কোন আদর্শবাদী শির আপনা হইতেই শ্রদ্ধাবনত হইয়া আসিবে।

ডিক্টেটর তন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের তুলনায় প্রসঙ্গতঃ ইতিহাসের অপর একটি অধ্যায়ের কথা স্মরণ করা যায়। পদচ্যুত রুশ ডিক্টেটর ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে ডিক্টেটর পন্থী সাম্যবাদী জগৎ যত কথাই বলুক না কেন, এই সত্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পাস্টারনেক ও সলঝেনিটসিনের মত বিশ্বজোড়া কীর্তি মানব দরদী লেখক আজও যে রাশিয়ায় জীবিত আছেন, স্বাধীন মত প্রকাশের অনুকূল সামাজিক আবহাওয়া যে রুশীয় সমাজ জীবনে আত্মপ্রকাশ করিবে বলিয়া আভাষ পাওয়া যাইতেছে, তাহার জন্য সংসাহসিকতার প্রশংসা লাভ করিতে পারেন ঐ একটি লোক—নিকোলাই ক্রুশ্চেভ। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিস্মৃত হওয়া চলে না যে, স্টালিনের জীবিতাবস্থায় ক্রুশ্চেভ স্টালিনের সকল দুষ্কৃতির ইতিহাস প্রত্যক্ষ ভাবে জানিয়াও প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই এবং নিজে তিনি রাষ্ট্রের উচ্চতম ক্ষমতায় আরোহণ করিতে না পারিলে কোন কালেই ঐ সকল সত্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেন না। বস্তুতঃ এই সংসাহসের মূল্য হিসাবেই তাহাকে অনতিকাল মধ্যে পদচ্যুত হইতে হইয়াছে। ডিক্টেটর তান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বত্র রাষ্ট্রযন্ত্র ষড়যন্ত্র ধর্মী। ব্যক্তিস্বাধীনতা সেখানে আরব্য উপন্যাসের গল্প কথার মতই অলীক—সাংবাদিকের স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না।

মার্কিন গণতন্ত্রের সবলতা ও পরিচ্ছন্নতা আজ বিচারালয়ের সম্মুখে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এই আর একটি অঙ্গ যাহার রোগমুক্ত সুস্থ-সবলতার উপর গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শবাদের প্রতিশ্রুত সকল সুবিচার ও স্বাধীনতা একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। এই অতি ব্যাপক সংস্থাটি আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের স্বয়ংশাসিত অঙ্গ। সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান প্রধান বিচারপতি ওয়ারেন

সাহেব প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নিজের মনোনীত ব্যক্তি এবং তাঁহার ঘনিষ্ট বন্ধু বলিয়া পরিচিত। তথাপি কোন একটি বিচারালয়েও প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁহার ইচ্ছানুরূপ প্রশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই। এমন কি অতি সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের একটি ঘোষণাতেও প্রধান বিচারপতি ওয়ারেণ অপর বিচারপতি গণের সঙ্গে একমত হইয়া প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল ক্ষমতাধিকারী ডিক্টেটর সদৃশ রাষ্ট্রপ্রধান আজ একেবারে নিঃসঙ্গ—অতি করুণভাবে একাকী। গণতন্ত্রের সহস্র দুর্ব্বলতার মধ্যেও যে অদৃশ্য বা অকস্মাৎদৃষ্ট সবলতা ও আদর্শ পরায়ণতা তাহাকে দীর্ঘজীবি করিয়া রাখিয়াছে তাহারই নবপর্য্যায়ের ইতিহাস লেখা হইতেছে ওয়াশিংটন, আব্রাহাম্ লিঙ্কন ও ফ্রাঙ্কলিন রুজভেলটের আমেরিকায়। যেখানে মিছিল বাহির হইতেছেনা, মাঠে ময়দানে বাকচাতুর্য্যের দ্বারা রাজপথ অবরোধ করিয়া নাগরিক জীবনে উৎপীড়ন সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইতেছেনা। উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজন হইতেছে না। স্বাধীন সাংবাদিকগণ তাঁহাদের অভিযোগ বিচারালয়ের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিয়া প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বিচারকগণ তাঁহাদের সত্য স্বাধীন ন্যায় বিচারের কর্ত্তব্যভার লইয়া মঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাষ্ট্রযন্ত্র নির্ভীক পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে একটি অনির্দ্দিষ্ট অথচ স্বাভাবিক পরিণতির দিকে।

অনুরূপ ক্ষেত্রে জনমনে স্বাভাবিক ভাবেই একধরণের তরল ও কটু কথায় রসগ্রাহীতা প্রশ্রয় পায়। নিঃসঙ্গ প্রেসিডেন্ট নিকসন আজ গড়পড়তা জনমনে সেই রসের যোগান দিতেছেন। কিন্তু, আমরা তাঁহার মধ্যেও এমন একটি উদ্ঘাত, সদৃশ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করিতেছি যাহা সত্যই বিস্ময়কর এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশেই এই চরিত্র সৃষ্টি হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়। যে সকল অভিযোগ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে, যে সকল অপরাধ অপ্রত্যক্ষ ভাবে হইলেও তিনি প্রায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং যেগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবার অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার চাপে যে কোন শক্তিশালী মানুষ ভাঙ্গিয়া পড়িত। বস্তুত, প্রেসিডেন্ট নিকসনের চতুর্দ্দিকে আজ আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, পায়ের নীচের মাটি পর্য্যন্ত তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তবু তিনি দাঁড়াইয়া আছেন যেন হিমালয়ের মতই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর। যে কোটি কোটী মানুষের সমর্থন পুষ্ট হইয়া তিনি পদাধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের সকলের সমর্থনের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার দায়িত্ব যেন তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যে সমাজের সমর্থন একদিন তাঁহাকে রাজ্যপাট দান করিয়াছিল আজ তাহারই নির্দ্ধারিত বিচার বিধি মতে তিনি সন্দেহাতীত ভাবে পরাজয় মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন তথাপি পদত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিবেন না ইহাই যেন তাঁহার সুদৃঢ় সঙ্কল্প। পরাজয় হউক একটি ব্যক্তির, কলঙ্কিত হউক একটী ব্যক্তি চরিত্র তবু তাহারই মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিচার পদ্ধতি ও সুবিচারের প্রতি মানুষের আস্থা আরও সুদৃঢ় হউক ইহাই যেন প্রেসিডেন্ট নিকসনের শেষ কামনা। অন্যথা কোন একটা আদর্শ সমস্ত সঙ্কল্পের জোর না থাকিলে মানুষ এমন ভাবে ঐরকম সম্মানিত স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে কি করিয়া? পদত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিলে তাঁহার

[শেষাংশ ১৬ পাতায় দেখুন]

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী

জীবন প্রভাত [দুই]

—সুবোধ মজুমদার

সিপাহী বিদ্রোহকেন্দ্রিক স্বাধীনতা সংগ্রাম জ্বলে উঠেছিল ১৮৫৭ সনে। ভারতবাসীর এই প্রথম ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও ব্রিটিশ সরকার কিন্তু চিন্তিত হয়ে উঠল ভীষণ ভাবে। পর বৎসরই সে স্বয়ং ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কাছ থেকে। তারপর দুষ্কর ইংরেজ কূটনীতি-বিদ্‌রা গবেষণা করতে শুরু করলেন—কি করে ইংরেজ রাজত্ব চিরস্থায়ী করা যায় ভারতবর্ষে। সুগভীর অনুসন্ধানের কয়েকটি গুরুতর তথ্য লাভ করেছেন তাঁরা :—

(১) ভারতবাসীরা সনাতন মানবধর্মে বিশ্বাসী বলে তাদের ধর্মীয় উদারতা পাশ্চাত্য জাতিগুলির চেয়ে অনেক বেশী। এজন্য তারা গৌরবান্বিত মনে করে নিজেদের। শুধু তাই নয়। তারা নিজেদের উৎকৃষ্টতরও মনে করে ইংরেজদের চেয়ে। ফলে তারা রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার করলেও, নৈতিক বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না ইংরেজদের কাছে। (২) ভারতবাসীরা সুনিশ্চিত ভাবে অবহিত রয়েছে তাদের সনাতন মানববাদী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে। তাদের মানববাদী সংস্কৃতির উৎস হচ্ছে সনাতন সংস্কৃত শাস্ত্র, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে সুপ্রাচীন দ্রাবিড় ও আর্য সভ্যতা লব্ধ অযোধ আধ্যাত্মিক ও শ্রেয়োনৈতিক জ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রভূত বৈচিত্র সত্ত্বেও তাই তারা মূলতঃ অনুসরণ করে চলেছে একই সংস্কৃতির ধারা। এই সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও একতাবোধ হেতু তারা বশ্যতা স্বীকার করতে পারে না ইংরেজ সংস্কৃতির কাছে। (৩) ভারতবাসীরা যাপন করে সরল, সহজ, মিতাচারী, ও সত্যাচারী জীবন। এই জীবন যাত্রার মূল উৎস হচ্ছে তাদের আদর্শবাদী জীবনদর্শন। আদর্শবাদ বলে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দ। সমাজের মানুষ অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জন করে সুখ লাভের উদ্দেশ্যে, আর সুখ লাভ করে আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে। আনন্দ লাভ হয় শ্রেয়োনৈতিক মূল্যবোধের পরিতৃপ্তি থেকে। ফলে জড়বাদী ইংরেজের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সমাজ জীবনের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে না ভারতবাসীর আদর্শবাদী মানবিক মূল্যভিত্তিক সমাজজীবন।

এমতাবস্থায় ক্ষমতাসীন ইংরেজরা স্থির করল প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত শাস্ত্রকে অবমানিত বা বিলুপ্ত করবে যে ভাবেই হোক। তখন ভারতবাসীর মন থেকে মুছে যাবে তাদের ধর্মীয় উৎকৃষ্টতাবোধ, সাংস্কৃতিক একতাবোধ ও সহজ সরল জীবনযাত্রার আকাঙ্খা। এতদুদ্দেশ্যে তারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিকৃত করে সেসব পাঠ্য করল স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে। সংকৃত জ্ঞান লাভ করে যাতে জীবিকার্জন করা সম্ভব না হয় সে ব্যবস্থাও সে-সঙ্গে করল তারা। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রকোপে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। ইংরেজী জানাটাই ক্রমশঃ তাদের কাছে হয়ে উঠল বিদ্যাবত্তার একমাত্র লক্ষণ। ১৮৮৫ সনে যখন স্বায়ত্তশাসনকামী জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হলো তখন ইংরেজী জানা লোকেরাই হলেন তার একমাত্র নেতা।

ইংরেজদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন বহু পূর্বেই রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাঁরা ভারতবাসীর কাছে প্রাচীন শাস্ত্রের মহিমা উপস্থাপিত করতে লাগলেন বিবিধ গ্রন্থ রচনা করে বা অন্যপ্রকার প্রচারাদি দ্বারা। স্বামী দয়ানন্দও প্রচার করতে লাগলেন

সুপ্রাচীন আর্যসমাজের গৌরব কাহিনী। রামমোহন প্রকাশ করলেন বেদান্তের ব্যাখ্যা, বিদ্যাসাগর প্রকাশ করলেন সংস্কৃত সাহিত্যের অবলম্বনে বাংলা কাহিনী, বঙ্কিম চন্দ্র প্রকাশ করলেন ভগবদ্গীতা, কৃষ্ণচরিত্র, আনন্দমঠ প্রভৃতি। নবীনচন্দ্র রচনা করলেন 'পলাশীর যুদ্ধ'। রমেশচন্দ্র লিখলেন বংগবিজেতা। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল একটা স্বদেশী আবহাওয়া। তারমধ্যে এলেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাদেশিকতার বন্যাপ্রবাহ নিয়ে। এলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবন দর্শন নিয়ে। এলেন সখারাম গনেশ দেউস্কর, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ মনীষীরা তাঁদের অনলবর্ষী লেখনী নিয়ে।

কিন্তু ইংরেজদের বিরাট সরকারী সংগঠন ও বিপুল আর্থিক ক্ষমতার তুলনায় মুক্তি পূজারীদের শক্তি ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। তারা খড়্গহস্ত হয়ে উঠল মুক্তি পূজারীদের দেখার বিরুদ্ধে। ফলে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই ভয় পেত মুক্তিপূজারীদের দ্বারা রচিত সত্যিকার জ্ঞান প্রদানকারী পুস্তকগুলি পড়তে। সরকারের নজরে পড়ে ও অর্থ উপার্জন করে সমাজে প্রতিপত্তি শালী হওয়ার আশায় তারা পড়ত ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকগুলিই। এই ছিল বংগদেশ তথা ভারতবর্ষের শিক্ষাগত পটভূমিকা বিশ শতাব্দী প্রাক্কালে ও প্রারম্ভ কালে। কিশোর রাসবিহারী স্কুলে-কলেজের ছাত্র ছিল তখন। পর্যাপ্ত বুদ্ধিশক্তির অধিকারী হয়েও সে কিছুতেই মন বসাতে পারত না স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলিতে। অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়ই অনেকাংশে দায়ী ছিলেন এর জন্য। সুহৃদ সম্মিলনীর মাধ্যমে যে সব স্বাবলম্বন ও স্বাদেশিকতার মন্ত্র তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন চন্দননগরবাসী তরুণদের মনে তারই প্রভাব এসে পড়েছিল রাসবিহারীর মনেও। তাই সে পড়ত প্রকৃত জ্ঞান প্রদানকারী পুস্তকগুলি।

ইতিহাস শিক্ষক কামালউদ্দিন চৌধুরী সাহেব একদিন ক্লাশে পড়াচ্ছিলেন ইংরেজের তৈরী বঙ্গদেশের ইতিহাস। তিনি বলছিলেন—বাঙালীরা ছিল নিতান্ত ভীতু কাপুরুষ, তাই বক্তিয়ার খিলজী মাত্র সতেরজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে জয় করেছিলেন এই বঙ্গদেশ। এ কাহিনী বিশেষ ভাবে সুপ্রচলিত হলেও যে মিথ্যে রাসবিহারী জানত তা। তাই বাঙালীর বিরুদ্ধে এই অপবাদ শুনে কঠোর প্রতিবাদ জানাল সে। শেষপর্যন্ত স্কুলে-কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হলো তাকে।

আইনের চাপে ও চাকরির দায়ে রাসবিহারীকে স্কুল কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করলেও চারুচন্দ্র রায় বিশেষ আকৃষ্ট হলেন তার প্রতি। তিনি নিভৃতে কথা বললেন তার সঙ্গে। রাসবিহারীর সুস্পষ্ট ধারণা—ইংরেজের শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে তার সেনাবাহিনী, সেখানে সজোরে হানা দিতে না পারলে কিছুতেই অপসারিত করা যাবে না তাদের। এর জন্য বিভাগের সোকজনদের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে হবে সুপরিকল্পিত ভাবে। তারপর একই দিনে বিদ্রোহ ঘটাতে হবে সিঙ্গাপুর থেকে কোয়েটা পর্যন্ত সকল সামরিক ঘাঁটিতে। চারুচন্দ্র আরও আকৃষ্ট হলেন রাসবিহারীর বিদ্যাবত্তা, চরিত্রবল ও স্বদেশপ্রেম দ্বারা। তিনি যেন বুঝতে পারলেন ভারতের আসন্ন মুক্তি সংগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই তীক্ষ্ণধী ছেলেটি। অতএব তিনি চিঠি দিয়ে রাসবিহারীকে পাঠিয়ে দিলেন বিপ্লবী নিরালম্ব স্বামী বা যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। যতীন্দ্রনাথ চাকরী করতেন একটি দেশীয় রাজ্যের সেনাবাহিনীতে, পরে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উত্তর ও মধ্য ভারতে বিপ্লব-মন্ত্র প্রচার করতেন নিরালম্ব স্বামী রূপে।

চন্দননগরে ইতিপূর্বেই বিপ্লবী দল সংগঠিত হয়েছিল উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, কানাই লাল দত্ত, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ তরুণদের সহযোগে। তাঁদের সংস্পর্শে এসেছিলেন রাসবিহারীও। তথাপি যতীন ব্যানার্জির কাছে রাসবিহারীকে যে পাঠানো হলো তার বিশেষ তাৎপর্য ছিল একটু। চারুবাবু জানতেন বিপ্লবী দলের ছেলেদের মধ্যে রয়েছে দু'রকমের চিন্তাধারা। একদল চাইতেন মাঝে মাঝে দু'একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটিয়ে

দেশময় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে। যদি মাঝে মাঝে দু'একজন ইংরেজ রাজকর্মচারীকে হত্যা করা হয় তাহলে ইংরেজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেবে একটু একটু করে, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের স্থান মর্যাদা বাড়বে দেশবাসীর কাছে। বারীণ ঘোষ ছিলেন এরকম চিন্তাধারার পোষক। অপর পক্ষে আর একদল বিপ্লবী চাইতেন সুদীর্ঘ সতর্ক প্রস্তুতির পর ইংরেজ শক্তির ওপর একেবারে শেষ আঘাত হানতে। অতর্কিত আঘাতে অপ্রস্তুত জনে যাবে ব্রিটিশ সরকার, তখন পালাবার পথ পাবে না সে। যতীন ব্যানার্জী ছিলেন এরকম চিন্তা-ধারার পোষক। রাসবিহারীকেও এরকম মনে করে চারুচন্দ্র যতীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে।

অবশ্য উভয় প্রকৃতির বিপ্লবীরাই পরস্পর মিলে মিশে কাজ করতেন একসঙ্গে। উভয় দলেরই লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। উভয় দলেই ছিল এমন বহু কর্মী যাদের আত্মত্যাগ ও মৃত্যুভয়হীনতা ছিল অতুলনীয়। তবুও এদুদলের লোকের চারিত্রিক গঠন সম্পূর্ণ পৃথক ছিল অপর দলের লোকদের থেকে। বারীণ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের কারাবরণ ও মৃত্যু-বরণের মূলে দেশপ্রেমের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল একটা রোমাঞ্চপ্রিয়তা ও সাময়িক উত্তেজনা। তাই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি দীর্ঘকাল ধৈর্য সহকারে বিপ্লবের পথে বিচরণ করা। বিপরীত পক্ষে, রাসবিহারী, পিংলে প্রমুখ বিপ্লবীদের পথ ছিল রোমাঞ্চহীন অধ্যবসায় নির্ভর। তাঁদের কারাবরণ ও মৃত্যুবরণ ছিল একটা সুদীর্ঘ বৃহৎ পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ স্বরূপ। তাই তো রাসবিহারী বৈপ্লবিক কর্মে নিযুক্ত ছিলেন সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। মৃত্যুর খড়্গ ঝোলার উপর উদ্যত ছিল তাঁর—ভারতবর্ষে ১৯১২ সন থেকে ১৯১৫ সন পর্যন্ত, আর জাপানে ১৯১৫ সন থেকে ১৯২৩ সন পর্যন্ত। আর বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন তিনি ১৯০৫ সন থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত।

বহুসংখ্যক বিপ্লবী দেশত্যাগ করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালে। মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখার্জি, হেরম্ব গুপ্ত, তারকনাথ দাস, সুধীন বসু, ভূপেন্দ্র দত্ত, বিনয় সরকার, সুরেনকর, বীরেন দাশগুপ্ত, বসন্ত সরকার শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ, ইত্যাদি অনেকেই ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে বসবাস করেছিলেন দেশের স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে। অনেকে কাজও করেছিলেন কিছু কিছু। অনেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সমাজে। একমাত্র রাসবিহারীই পরবর্তী যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য পঁচিশ বছর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন বিদেশে থেকে। অবশেষে সুদূর প্রাচ্যে ভারত-স্বাধীনতা সংঘ ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ সংগঠিত করে তিনি রচনা করেছিলেন ইংরেজ শক্তিকে শেষ আঘাত হানার পটভূমিকা। বিশ্বযুদ্ধের দুর্যোগের সময় তিনিই সম্ভব করেছিলেন জাপান সরকার দ্বারা নেতাজীকে জার্মানী থেকে প্রাচ্য দেশে নিয়ে আসার সবকিছু ব্যবস্থা।

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত

॥ এই পত্রিকা ॥

—আপনি পড়ুন ও অন্য সবাইকে পড়ান—

বিদেশে মগজের নির্গমন

—শান্তিশরণ রায়চৌধুরী

কিছুদিন আগে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে ভারতবর্ষ থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং বৈজ্ঞানিকের দল আমেরিকা গিয়ে কর্মরত থাকার জন্য ভারতবর্ষের আর্থিক ক্ষতি হয় প্রচুর। যতদূর মনে হয় টাকার অঙ্ক হিসাবে প্রতিজনে আমাদের লোকসান হয় তিন লক্ষ তেরিশ হাজার টাকার মত, আমেরিকার লাভ হয়, ৫১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। প্রতিটি ছাত্রকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তৈরী করার জন্য, আমাদের দেশের ব্যয় হয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা, কিন্তু প্রতিদান তাদের থেকে আমরা পাই না কিছুই। আমেরিকা তাদের থেকে লাভবান হয় বিরাট ভাবে। এ যেন কাকের কোকিলের বাসায় ডিম পেড়ে, কোকিলের উপর দিয়ে সব ঝুট ঝামেলা চালিয়ে দিয়ে সময়মত নিজের বাচ্চাকে পরিণত অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া। আমেরিকা যেন তাদের কর্মীদলকে ভারতের খরচায় তৈরী করিয়ে নিয়ে সময়মত নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নেয়। নেপোয় দই মারার অবস্থা।

সম্প্রতি U. N. Conference of Trade and Development (UNCTAB) একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে এ সম্বন্ধে। তাতে দেখা যায় মগজ নির্গমনের অবাধ স্রোত (Brain drain) এশিয়া, আফ্রিকা, ও ল্যাটিন আমেরিকা প্রভৃতি অনেক উন্নয়নশীল দেশ থেকে। পরিস্থিতিটা শুধু উদ্বেগজনকই নয়, রীতিমত ভয়াবহ। এই নির্গমন অবিলম্বে বন্ধ করতে না পারলে, উন্নতিশীল দেশগুলি প্রতিভাশূন্য হয়ে পড়বে অচিরেই এবং এই সব দেশের ভবিষ্যৎ সূচীভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

একটু পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করলে সাম্রাজ্যবাদীদের নবতম শোষণ পদ্ধতির স্বরূপটা আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। একদিন হয়ত দেখা যাবে মগজ আমদানী করে, তথির তদারক করে মগজ ধোলাই করে এই সব দেশে তাদের স্বার্থ সাধনের কাজে লাগাচ্ছে এদের। অবশ্য এই তৈরী মাল উপভোগ করবার ক্ষেত্রে আমেরিকা একলা নয়। তার সঙ্গী হচ্ছে কানাডা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ।

১৯৬১-৭০ সাল, এই দশ বছরে একমাত্র আমেরিকাতেই ৫৩,০০০ হাজার লোকের অন্তঃপ্রবাহ ঘটেছে। ১৯৬২-৭০ সালের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নিযুক্ত তালিকায় শতকরা কুড়ি ভাগেরও বেশী এসেছে বিদেশ থেকে। ১৯৭০ সালে আমেরিকাতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে বহিরাগত এই বিশিষ্ট শ্রেণীর মানুষদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৯ ভাগ। অবশ্য এই হিসাবটাও সঠিক অবস্থার পরিচায়ক নহে। কারণ উপরোক্ত দেশগুলি থেকে যাঁরা কানাডা, ইংল্যাণ্ড বা অন্যত্র চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আমেরিকাতে এসেছেন, তাদের নাম, তাদের জন্মস্থান থেকে আগত বলে দেখান হয়নি। উন্নয়নশীল দেশ থেকে বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান।

১৯৬৯ সালে ১৮১০ জন এই ধরণের বিশেষজ্ঞরা এসেছিলেন আমেরিকাতে, তার মধ্যে ১,১৭৫ ছিলেন বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়র, ৬৩৫ জন ডাক্তার। ১৯৭০ সালে, এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল সর্ব্বসাকুল্যে ১১,২৪৬ (৯০২৫ বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়র ২২১১ জন চিকিৎসক)

এই সমীক্ষাটি মগজ নির্গমন তথা মগজ আমদানীর অর্থনৈতিক ফলাফলের বিচার করেছেন। বলছেন যে এই মগজ নির্গমনের অর্থনৈতিক মূল্য হচ্ছে ৩৭০০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার। আর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে সাহায্যদানের উদারতার বড়াই এরা করে, তার মূল্য হল ৩১০০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৭০ সাল থেকে কয়েকটি দেশের বিশেষ করে আমেরিকা ও কানাডার মগজ-আমদানী করার নীতিকে উদার করা হয়েছে, বিশেষ করে দক্ষ কর্মীদের সম্বন্ধে। এর ফলে এদের লাভের খাতায় জমা পড়ছে প্রচুর।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। যে সব শ্রেণীর লোকেদের এরা নিজের দেশে নিয়ে নিচ্ছে, তাদের বয়ঃসীমার স্বল্পতা এবং তারুণ্য। ১৯৭০ সালে এই সব বহিরাগত বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়রদের শতকরা ৪৯ ভাগের বয়স ছিল তিরিশের নীচে, শতকরা ৪৮ ভাগ ছিল ৩০-৩৪ বছরের মধ্যে। সব থেকে কম বয়সের লোক এসেছে এশিয়া এবং আফ্রিকা থেকে. সমগ্রের মধ্যে যাদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৪ ভাগ। এশিয়াবাসীদের মধ্যে ৩০ বছরের নীচের সংখ্যা ছিল ৪৪% এবং আফ্রিকানদের সংখ্যা ছিল ৫২%।

১৯৭০ সালে আমেরিকাতে এই ধরণের বিশেষজ্ঞদের আগমন এশিয়া থেকেই ঘটেছে বেশী। ৯০০০ ছিল তাদের সংখ্যা। ১২০০ আফ্রিকা থেকে এবং ২০০০ ল্যাটিন আমেরিকা থেকে। সব চেয়ে বেশী এসেছিল ভারতবর্ষ থেকে, তাদের সংখ্যা ছিল ৩০০০ হাজার. ফিলিপাইনস্ থেকে ২০০০ হাজার। এর ফলে, আমেরিকার খরচা বাদ দিয়ে আয়গত মুনাফা ছিল এশিয়া থেকে ৩০০০ মিলিয়ন ডলার, আফ্রিকা থেকে ৪৭০ মিলিয়ন ডলার, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ৪০০ মিলিয়ন ডলার।

ঐ সংস্থা আরো বলেছেন উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে মগজ নির্গমনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আয় হয়েছে বিরাট। তারা আরো বলেছেন, এটা খুব আশ্চর্য্য যে এই বিরাট আয়ের ব্যাপারে বেশী অবদান সেই সব দেশের, যারা উন্নয়নশীল জগতে দরিদ্রতম বলে পরিগণিত।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান আলোচনা করলে এই সত্য দিবালোকের মত পরিস্কার হবে যে আমেরিকা ও কানাডার এই নতুন শোষণ নীতি ভারতবর্ষকে গুরুতর বিপদের মুখে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব দেশ তারুণ্যের দিকে বিশেষ নজর রেখে অন্য দেশের তৈরী বিশেষজ্ঞ আমদানী করছে। এতে করে শুধু স্বল্প সময়ের জন্য নয়, দীর্ঘদিন ধরে এদের শ্রম, অধ্যবসায় ও প্রতিভাকে শোষণ করে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সাকে চরিতার্থ করতে পারে এবং শুধু অর্থনৈতিক দিয়ে নয়, সমগ্রভাবে শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদও আহরণ করতে পারে। আমাদের প্রতিবেশী শোষিত দেশগুলি কিভাবে এর মোকাবিলা করবেন বা করছেন, সেটা আমাদের আলোচনার মধ্যে নয়। তাঁরা নিজেদের বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হবেন এবং দেশের কল্যাণের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমরা আমাদের দেশ সম্বন্ধেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

এই যে এতগুলি গুণী যারা দেশের ভবিষ্যতের আশা ভরসা, তারা কেন বিদেশে চলে যাচ্ছেন? কিছু সংখ্যক এদের মধ্যে আছেন, যারা হয়ত পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দের মোহে দেশান্তরী হচ্ছেন। তাঁরা সমাজের নিকট যে ঋণ পরিশোধ করতে মানুষ হিসাবে বাধ্য, সেই দায়দায়িত্বও ভুলে গিয়েছেন। তারা হয়ত তাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের পরিণামের কথাও ভাবছেন না। তাদের প্রয়োজন ফুরালেই যে তারা ও দেশগুলিতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত হবেন, সে দূরদৃষ্টিও তাদের নেই। তাদের ছেলে মেয়েরা যে কোন প্রকার "হাস-ভাঙ" জীব তৈরী হবে, সেকথাও আমলে আনছেন না। দাঁড়কাক যতই ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করুক আখেরে দাঁড়কাকের প্রাপ্য সম্মানের বেশী কিছুই সে পাবে না। দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে আত্মস্বার্থকে একমাত্র প্রাধান্য দিচ্ছেন, এমন লোকের অভাবও এই দলের মধ্যে হবে না। কিন্তু এই কারণগুলিই সব নয়। এখানে বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্র এবং মান খুব উচুস্তরের নয়। এদের যথা প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না, এদের আকাঙ্খিত সুযোগ সুবিধার বন্দবস্ত কিছুই নেই, এদের পারিশ্রমিকও সামান্য, এমনকি এদের মধ্যে অনেকেই বেকারও ছিলেন। রিসার্চ-এর ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের দস্যুদের দ্বারা এরা নিপীড়িত। এদেশে তরুণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে আত্মহত্যা করতেও দেখা যায়। এই সব অমার্য্যাদাকর ব্যবস্থার উৎখাত করতে হবে। এদের প্রার্থিত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আমলাতন্ত্রের খেয়ালখুসী মত, আর যাই করা যাক্ রিসার্চ বা গবেষণা করা সম্ভব হয় না কখনও। আমলাতন্ত্রের কীর্ত্তি ও প্রশাসনিক স্তরে আমরা দেখেছি। এরা নতুন যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে শেখেনি, চলতেও চায় না। এদেশের মেধাবী ছাত্র বৃত্তি পেয়েও ২।৪ বৎসরের মধ্যেও, এমনকি অনেকস্থলে গোটা ছাত্রাবস্থায় তাদের স্কলারশিপের টাকাও পায় না। দেশটাকে ত এরা সর্বনাশের অতলতলে দিয়ে যাচ্ছে। পরিতাপের কথা, আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দও যেন অসহায়। আমাদের জানা আছে, রিসার্চ স্কলারদের অন্যদেশে দশটা পাঁচটা অফিসের লাল-ফিতার দাপটে কাজ করতে হয় না। সমস্ত দিন তাদের কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার অবারিত থাকে, তারা প্রয়োজন মত যখন তখন হাজির হয়ে নিজেদের কাজকর্ম্ম করে যান। অবশ্য অর্থ-নৈতিক গুরুভার তাদের কাঁধের উপর ভূতের মত দুর্ব্বহ বোঝা হয়েও তাদের নিষ্পেষিত করে, প্রতিভার স্ফুরণকে টুটি চেপে ধরে ধ্বংস করতে পারে না। তার পর, সর্ব্বোপরি বিদেশগত সমস্ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে স্বদেশ প্রেমকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে, শুধু লম্বা চওড়া ভাষণের মধ্য দিয়ে নয়, নেতৃবৃন্দের আদর্শ চরিত্রের মাধ্যমে। তাদের অনুভব করাতে হবে, জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরিয়সী। অবিলম্বে এদের সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের যোগাযোগ করতে হবে। তাদের সাধনা লব্ধ জ্ঞানকে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের অসুবিধা ও দুঃখের কথা জেনে, সেসব এখনই দূর করে এদের দেশে ফিরিয়ে আনতেই হবে অবিলম্বে। নতুবা দেশের ভবিষ্যৎ যুচে যাবে। কেন তারা ৩০ বৎসর বয়স থেকে অন্য দেশের গোলামী করবে, বিশেষ করে এমন সব দেশের যারা চায় ছলে, বলে কৌশলে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে দারিদ্র সীমার নীচে রেখে, সমস্ত সম্পদ একচেটিয়া ভাবে ভোগ করতে? নিজেদের দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ না করে, কেন তারা অধিকাংশ মানুষের দুর্গতিকে চিরস্থায়ী করবে? আমাদের দাবী, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে, তাদের ফিরিয়ে

আনবার ব্যবস্থা করতেই হবে। অন্যথায়, আমাদের এই প্রতিযোগীতামূলক বিশ্বে টিকে থাকবার কোন আশা নেই। এই সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধানের ব্যবস্থা করা দরকার। দেশের মানুষই দেশের প্রকৃত সম্পদ। সেই সম্পদ নষ্ট হলে বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করে কাজ না করলে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ বলে পরিগণিত হবে।

প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মনে হয় কিছুদিন আগে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন এই সম্বন্ধে। নিছক বিবৃতি দিয়ে এই অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারে কোন সুরাহা হবে না। চাই কাজ, চাই মৌলিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। দেশের ভবিষ্যৎ এর কথা হৃদয়ঙ্গম করে, অতীত দিনের ত্রুটী সংশোধন করুন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে এই সব বহির্মুখী প্রতিভাধরদের দেশের মধ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে তৎপর হোন এই আমাদের দাবী।

চিঠি পত্র

বিপ্লবী বাংলার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

বিপ্লবী বাংলার তৃতীয় বর্ষের ১৩ সংখ্যায় (২৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ সন শনিবার ১৩ই পৌষ ১৩৮০) শ্রী ক্ষীরোদ কুমার দত্ত মহাশয়ের লিখিত বীর বিপ্লবী বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন তার এক জায়গায় বার্লিনে Indian Independance Committee তে যাঁহারা ছিলেন তার মধ্যে অধ্যাপক শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ নামে যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ভুল আছে। অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র ঘোষের পরিবর্তে উহা অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন হইবে। এ সম্বন্ধে আপনি ৺ডঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস বইখানা দেখিলেই এই ভুল ধরা পড়িবে। এছাড়া শ্রীমতী সুপ্রিয়া তালুকদারের কাছে তার পিতার জার্মানীতে তোলা একখানা ফটো আছে যাহাতে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ চন্দ্র সেন এবং অন্য আর একজন আছেন, তিনি সাভারকার কিনা সেটা অনেক চেষ্টা করেও হদিস করতে পারি নাই। এই ফটোটা ১৯১৩-১৯১৫ সনের মধ্যে তোলা।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সংশোধনটি আপনার বিপ্লবী বাংলায় প্রকাশ করিলে সুখী হইব। ইতি—

নমস্কারান্তে

শ্রীব্রহ্মদাস তালুকদার

প্রখ্যাত সাংবাদিক ফ্রাংক মোরেসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

নিস্তব্ধতার সুগভীর ক্ষণে

—বীরেন দে—

চৈনিক নেতৃত্বের পশ্চাতে :

তারপর শুনুন Kwangsi Daily 26th Oct, 1954 কে লিখে :

"Six thousand peasants of Kwangsi Province revolted and fought Communist troops for a full week after Red guard shot peasant leaders for resisting a local administrative order."

সর্বশেষ Yangtze Daily র 3rd March 1954এর সংখ্যায় খবর ছিলো :

"Workers stoyed mass anti government demonstrations in the streets of Han Kaw. Sixteen purcent coolies accused of inciting them to disturb general peace and security, were sentensed to death at a public trial."

জনসাধারণের দোষ কোথায়? যে দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তার কোন দাম নেই, সে দেশে সশস্ত্র বিক্ষোভ ছাড়া অন্য কি পথ অবশিষ্ট থাকে? অবশ্য সেটা আমাদের বক্তব্য বিষয় নয়। আমরা বলতে চাই, মার্কসবাদ লেনিনবাদের নামে নেতৃত্বের হঠকারীতা কি প্রকারের সন্ত্রাসসৃষ্টির দ্বারা আদর্শবাদ রূপায়ণের ভাওতায় নেতৃত্বের নৃশংসতা কিরূপ। পরিণামে এই স্বেচ্ছাচারী স্বৈরতন্ত্রের প্রতিক্রীয়া কিভাবে রূপ পরিগ্রহ করে তাহাই জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা।

মাও-সে-তুংএর নেতৃত্বে চীন কমিউনিষ্ট পার্টির আন্দোলনে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সতর্ক ব্যক্তি হচ্ছেন চৌ-এন-লাই। তিনি তাঁর চারদিকে এঁদের দেখতে পাচ্ছেন :

Supreme State Council এবং National Defence Council—এই দুটিই হচ্ছে চীনের সর্বোচ্চ পদ অধিষ্ঠিত করে মাও।

প্রেসিডেন্ট—লিউ-শাও-চি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী—মার্শাল লিন-পিয়াও। (ইতিমধ্যে উৎসারিত)

তাত্ত্বিক—চেন-পো-তা। কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী—জেনারেল তেং-সিয়াও-পিং। পিপল্‌স্ ডেইলির সম্পাদক—তেং-তো। আন্দোলন ও প্রচার বিভাগের প্রধান—চৌ-ইয়ান। ষ্টেট প্লেনিং কমিশনের চেয়ারম্যান—লি-সু-চুন।

প্রথম থেকেই মাও চীনকে ভারী শিল্পের উপরে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। শিল্পের দিকে জোর দিতে গিয়ে কৃষি উপেক্ষিত হলো। ফলে দাঁড়ালো :

১৯৪৯ সালে শ্রমিকের সংখ্যা — ৩০ লক্ষ
১৯৫৩ ,, — ৬০ ,,
১৯৫৭ ,, — ৯০ ,,

শ্রম দিবস তখন ছিল ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা। ছুটির ব্যবস্থা ছিলনা। শিশু ও নারীদের শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগানো হোতো। শিক্ষানবিশির সময় ছিল ৫ থেকে ৭ বৎসর। সে সময় সমগ্র চীনের জনসংখ্যার মাত্র ২ শতাংশ শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত ছিল। আর বাকী সব কৃষিকার্যে ব্যস্ত।

শিল্পের চাহিদা বেড়ে গেলো। কৃষকরা নিজেদের পেশা ছেড়ে শহরে ভীড় জমাতে লাগলো। মাও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি ঘোষণা করলেন The great Leap forward অর্থাৎ 'বিরাট লম্ফের' প্রবর্তন। তাতে কি দাঁড়ালো দেখা যাক :

ঘোষণার পূর্বে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা—২৪৫ লক্ষ।

এক বছরেই ১৯৫৮ সালে শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা—৪৫০ লক্ষ।

অদ্ভুত বেতের দীর্ঘ লম্ফের বৃহৎ স্ফীতি। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ঘোষণা—20 years of progress in a sirugle day অর্থাৎ 'দিনের উন্নয়ন একুনে'। এই স্লোগানে একবছরেই ব্রিটেনের সমকক্ষ। পরিকল্পনা ছিল এইরূপ : তখন যৌথ কৃষি চলছিলো অবৈজ্ঞানিক ভাবে।

১৯৫৭ সালে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছিল—১৮৫ মিলিয়ণ টন। ঠিক করা হোলো ১৯৫৮ সালেই খাদ্যশস্য উৎপন্ন করতে হবে—৩৭৫ মিলিয়ণ টন। এবং ইস্পাত উৎপন্ন করতে হবে—১১ মিলিয়ণ টন।

কার্যক্ষেত্রে কি দাঁড়ালো : খাদ্যশস্য নেবে গেল—২২৫ এ ইস্পাত নেবে গেল—৮৫। ফলে : শিল্পোৎপাদন শিল্পোন্নয়ন কমে গেল—৫০ শতাংশ। কৃষি কমে গেল ৩৫ শতাংশ। দেশের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকলো। খাদ্যাভাব দেখা দিতে লাগলো। কারখানাগুলিতে কাঁচামালের অভাব। অপরদিকে শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা গেল কমে।

১৯৫৯ সালে ৪৫০ থেকে ৪৫৫ লক্ষ

১৯৬০ ৪৫০ ৪৪০

১৯৬১ ৪৫০ ২৮০

শ্রমিকদের দৈনিক কাজ ১২ ঘণ্টা থেকে ১৬ ঘণ্টায় নিয়ে আসা হয়েছিল। "তিন ছেবের কঠোর পরিশ্রমে দশ হাজার বৎসরের সুখ"—এর মুখ কেউ দেখতে পেলনা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মাও এর অবৈজ্ঞানিক খাম-খেয়ালি পরিকল্পনা। "বুক কাটলোতো মুখ ফাটলোনা।" কিন্তু ১৯৬১ সালের প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান লি-ফু-চুনের মন্তব্যে বাধ সাধলো :

"Not merely has agriculture been neglected to promote heavy industry, but there has also been a waste of men, money and materials. Thre has been inefficient planning." তুল বুঝেই মাও ফরমান দিলেন, কৃষিকেই এখন মুখ্য বলে মানতে হবে। যে হুকুম সেই কাজ : শ্রমিকরা গ্রামে ফিরলো। গাড়ী তৈরীর কারখানায় এখন ট্রাক্টর তৈরী হতে লাগলো। ঘড়ি নির্মাণের কার-খানায় কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। এ যেন একটা ছিনিমিনি খেলা। চীনা সরকারের রিপোর্টেই দেখা গেলো : লিয়াওনিং প্রদেশে ৩১ টি শিল্পাঞ্চলে ৪০ হাজার লোহা পড়ে আছে। মুকডেনে প্রদেশে ১০০০ ইলেকট্রিক মোটর অবেহেলা। এইরূপ অনভিজ্ঞতা ও পাগলামির ফলে একটা নিরারুণ অবস্থার সৃষ্টি হোলো। অপরিণত বুদ্ধির পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া কানাডা ও ফ্রান্স থেকে ৩৬২৫ মিলিয়ণ ষ্টার্লিং মূল্যের খাদ্য আমদানী করতে হলো। রপ্তানী সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গেল। ফলার বাদ, সোনার বুলিয়ান এবং অধিকৃত তিব্বত থেকে অপহৃত মূল্য গলিয়ে লণ্ডনে চালান করা হলো। এবার লি-ফু-চুন মন্তব্য করলেন :

"Our national economy developed from imbalance to balance and then again to inbalance."

চীনের এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে অগনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রতিবারই জোর করে গ্রহণ করানো হোল। কাওকে বিরোধী মনে করলেই সুকৌশলে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নিজের একনায়কত্ব বজায় রাখা চললো। তাঁর নেতৃত্বে চীনের সামরিক শক্তি, রণকৌশল ও বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কাহিনী অবশ্য আমরা অন্য সময় আলোচনা করবো। কিন্তু ইতিমধ্যে পররাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতিতে নিদারুণ ব্যর্থতা ও দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ফলে মাওয়ের শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়লো। তিনি প্রায়ই শয্যাশায়ী হতে আরম্ভ করলেন। শুরু হয়ে গেল উত্তরাধিকারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কোনরকম 'coup'ও হয়ে যেতে পারে।

এ অবস্থায় চতুর চৌ-এন-লাই উত্তরকালে চেয়ারম্যান হওয়ার কিছিৎ ফন্দি আঁটবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। তিনি শ্রীমতী মাওকে কাজে লাগাচ্ছেন। শ্রীমতী মাও 'চিয়াং-চিং' নামে চীনের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন। মাও এর সঙ্গে বিয়ের আগে তিনি এক ধনী হোটেল মালিকের স্ত্রী ছিলেন। মহিলা কোনদিন রাজনীতি না করলেও অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। চৌ-এন-লাই ঠিক করলেন শ্রীমতিকে সম্মুখে রেখে সকল দাবীদারকে শেষ করতে হবে। Caltural Revolution or 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' নামে এক পরিকল্পনা তৈরী করা হোল। ঘোষণা করা হোল 'মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন' ও ষ্ট্যালিনের চেয়ে অনেক বড় হচ্ছেন চেয়ারম্যান মাও। আধুনিক বিশ্বে এমন কেও নেই যিনি চেয়ারম্যান মাও এর সমকক্ষ। একটি দলিলে বলা হোল :

সাংস্কৃতিক বিপ্লব এমন বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে যার শক্তি প্রচুর ও সুদৃঢ়। এই বিরোধীতা আসছে প্রধানত কর্তৃত্বের আসনে আসীন সেইসব ব্যাক্তির কাছ থেকেই, যাঁরা পার্টির মধ্যে ঢুকিয়ে বসেছেন এবং ধনতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করছেন। রাজনৈতিক, তত্ত্বগত, সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক এই চারটি স্তরেই বিরোধীদের বহিষ্কার করতে হবে।"

দলিলের শেষ কথাগুলিতেই চীনে নেতৃত্ব বিষয় বক্তব্য শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যে মস্কো থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারী সোভিয়েত সংবাদ পত্র 'প্রাভদার' একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। চীনে দুঃসহ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে আড়াই লক্ষ চীনা নাগরিক নাকি ইতিমধ্যে হংকং ও ম্যাকাও এ চলে এসেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের শুরুর পর থেকেই নাকি শরণার্থীর স্রোত বাড়তে থাকে। তাই পিকিং সরকার এখন আন্তরাজ্য সীমান্ত প্রহরীদের শক্তি বৃদ্ধি করছেন। পরবর্তী সময়ে 'তাস' এর ভাষ্যকরের একটি মন্তব্যে আন্দাজ করা যায় যে, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের সঙ্গে সবচেয়ে জনবহুল দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য কি। সহজ কথায় বলা চলে, শক্তিশালী দেশ নিজেদের ধনতান্ত্রীক কায়েমী স্বার্থ সুদৃঢ় রাখতে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চায়, আর জনবহুল দেশ চায় নিজেদের ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখবার জন্য ক্রমবর্দ্ধমান জনতাকে বলি দিয়ে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করতে।

(ক্রমশঃ)

বিপ্লবী বাংলা

—পূর্ব্বানুবৃত্তি—

—বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত

খণ্ডিত হলেও আর্য্যবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথ নিয়ে যে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ, এই ভারতবর্ষের যে সংবিধান অর্থাৎ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের লক্ষ্য, আদর্শ, সংগঠন ও পরিচালন পদ্ধতি সেদিনকার সদ্য পরাধীনতা মুক্ত রাজনৈতিক স্বাধীন ভারতের নির্বাচিত ভাগ্য বিধাতার বাক্ বিতণ্ডার পর স্থির করে এই ইণ্ডিয়া তথা ভারতবর্ষের মাথায় চাপালেন, সেটা যে এই ভারতবাসীদের পক্ষে কতটা বিয়োগান্ত উপহাস তা যতই দিন যাচ্ছে ততই প্রকট হয়ে চলেছে। বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি এমন কারও ধৈর্য্য থাকে যে দিল্লীর পার্লামেণ্টের লাইব্রেরী থেকে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলীর প্রসিডিংস অর্থাৎ কার্য্য বিবরণী ধৈর্য্য ধরে পড়ে যান তবে তিনি দেখবেন যে এই সংবিধান ভোটে দেবার পূর্বে, সংকররাও দেও থেকে সুরু করে সর্দার হুকুম সিং পর্য্যন্ত যিনি দীর্ঘকাল ধরে লোকসভার ডেপুটি স্পীকার এবং স্পীকার ছিলেন, সকলেই এই সংবিধানকে কি রকম তীব্রভাষায় সমালোচনা ও আক্রমণ করেছেন। সর্দার হুকুম সিং এই সংবিধানকে হাইব্রীড্ কনষ্টিটিউসন বলে আক্রমণ করে বলেন যে অষ্ট্রেলিয়ার ঠ্যাং আমেরিকার মাথা, ইংলণ্ডের অমুক, অমুক দেশের অমুক নিয়ে এক বিচিত্র ধরণের সংবিধান তৈরী হল। বস্তুতঃ দুনিয়ার ইতিহাসে এরকম একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের বিজাতীয় ব্যবস্থা বড় একটা দেখা যায় না। আমাদের এই স্বাধীন ভারতের সংবিধানে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আছে, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী আছেন আরও সমস্ত অভারতীয় দেশের অভারতীয় ব্যবস্থা আছে কেবল নাই ভারতবর্ষ অথবা ভারতবর্ষের জনগণ বা ভারতবর্ষের নিজস্ব কোন ধারা। তারা আছেন কেবল ভোট দেবার বেলায়।

আমি সংবিধানের ভাষা করতে বসি নাই, তার ভাষা ব্যাখ্যা প্রভৃতি এই পঁচিশ বছর ধরে বহু আইনজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও পণ্ডিতেরা করে গেছেন করছেন ও করবেন। কিন্তু এটা আমি আস্ফালন করে বলছি যে আমাদের এই সংবিধান দিয়ে ভারতবর্ষের রচনা হয়নি, হচ্ছেনা—হতে পারেনা।

রাজা রামমোহন থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ তিলক নেতাজী গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতের শত শত দিকপাল চিন্তানায়ক, মণীষী, বিজ্ঞানী, দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের চিন্তাধারা তাদের প্রতিভা তাদের সাধনা দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, শুধু ভারতবর্ষেই নয় বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, ভারতবর্ষের অন্তরে তা নিয়ত অনুরণিত হচ্ছে কিন্তু তার কোন অনুরণনও এই সংবিধানে নেই। কেরালা কুমারিকা থেকে আরম্ভ করে পাঞ্জাব ও আসামের গ্রামভূমি বিচরণ করে এসো এই সংবিধানটি হাতে নিয়ে তারা এর ধারে পাশে কোথাও নেই। দুনিয়ার ইতিহাসে কোন দেশের লিখিত বা অলিখিত সংবিধানে ইণ্ডিয়া তথা ভারত—ঠিক এই মেকদারে কোন একটা দেশের বহুমূল্য নাম স্বীকৃত হয়নি। ভারতবর্ষের জনগণ কঠিন সংগ্রাম করে ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়ালেও ইংরেজ শাসন মুক্ত স্বাধীন ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এবং দেশ প্রেমিকেরা যারা সংবিধান রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তারা বৈদেশিক সাংস্কৃতিক অনুরোগের ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি। তার ফলশ্রুতি এই ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে এক বিকৃত-বিমাতার অভারতীয় যে আসল সংবিধান তৈরী হলো।

এই সংবিধান রচনার আর একটি বৈশিষ্ট হল এই যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার খসড়া কমিটির (ড্রাফট কমিটি) চেয়ারম্যান ছিলেন ডঃ আম্বেদকর। তিনি স্বর্গগত তার সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলাই ভাল তবে তিনি যে শুধুই ভারতের গণসংগ্রামের বিরোধীই ছিলেন তা নয়—ভারতের গ্রাম এবং গ্রাম্য জীবনের সম্বন্ধে তার তীব্র ঘৃণা এবং অনীহা ছিল যা তিনি এই সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট এবং তীব্র ভাষায় প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করেন নি। অথচ ভারতবর্ষের যা কিছু সব কিছু এই গ্রামভিত্তিক। এই গ্রামকে অশ্রদ্ধা করে ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করা যায় না। ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা না করলে তার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা রচনা করা যায় না। এই সংবিধানে অনেক বড় বড় কথা আছে, ব্যবস্থা আছে কিন্তু তা ভারতবর্ষকে পরিবর্তন করেই শুধু নয় ভারতবর্ষকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করে। ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত পাশ্চাত্য ভাবানুসারী এক সমষ্টি ভারতের জনগণের উপরে বিজাতীয় এক ব্যবস্থার বোঝা চাপিয়ে তাকে পঙ্গু করে গিরিলঙ্ঘন করার প্রচেষ্টা করেছে। এই হচ্ছে আমাদের স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র রচনার সংবিধান

(ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

গত কয়েকদিনের মধ্যেই তিনজন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া আমরা বেদনা অনুভব করিয়াছি। প্রায় প্রতিদিন এমনি দুঃসংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিতেছে। "জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে" এই নিদারুণ সত্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। তবু দীর্ঘদিন ধরে যাঁদের সঙ্গে সুখে দুঃখে জড়িত থাকতে হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে পূর্ণবিচ্ছেদ বেদনাদায়ক বটেই।

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত পাইন (বরিশাল) এই তিন জনের মধ্যে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল অবিভক্ত বাংলার সমস্ত জেলা ব্যাপী। তিনি ছিলেন পরলোকগত শ্রদ্ধেয় নেতা ত্রৈলোক্য মহারাজের ঘনিষ্ট সহকর্মী, বিশ্বস্ত এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সাথী। দীর্ঘকাল অজানা বিপদসঙ্কুল পথে তাঁরা একত্রে পরিক্রমা করেছিলেন।

পটুয়াখালির প্রবীন বিপ্লবী শ্রীশৈলেশ সেন গত ৩রা আগষ্ট ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিপ্লবী মহলে লাটু সেন নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা সতীন সেন মহাশয়ের ঘনিষ্ট সহকর্মী ছিলেন। দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সুরু থেকে ১৯৪২ সালের 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' আন্দোলন পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ দীর্ঘ ১২ বৎসরের বেশী কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, নিরভিমান এবং অমায়িক। এক কথায় বলা চলে তিনি ছিলেন অজাতশত্রু।

গত ২৯ শে জুলাই ৬৯ বৎসর বয়সে বিশিষ্ট বিপ্লবী নিরঞ্জন নন্দী দিল্লীর এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। অনুশীলন সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানের পরই তিনি ধৃত হয়ে দীর্ঘ ৭ বৎসর রাজবন্দী হয়ে কারান্তরালে থাকেন। মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর কর্মস্থল ছিল দিল্লী। দিল্লীতে তিনি নানা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন।

এই সমস্ত বিপ্লবীদের অবদানের জন্য সারা দেশ তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। তাঁদের দেহাবসানের পর জাতিগঠনের দিনে বর্তমান নেতৃবৃন্দ ও কর্মীবৃন্দ, তাঁদের জীবনের আদর্শ, ত্যাগ, দুঃখ বরণের দৃষ্টান্ত অনুভব করে এবং অনুসরণ করে যদি দেশ ও জাতিকে দিনে দিনে সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হন, তবেই তাদের প্রতি প্রকৃত সম্মান জানান হবে।

আমরা এই সব শ্রাদ্ধেয় বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

(চতুর্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

এমন কি বেশী ক্ষতি হইত? সদ্য-সভাপতি এগন্থ সেই পথ শ্রেয় বলিয়া মনে করিয়াছেন—অতঃপর তাহার বিরুদ্ধে আর তো কোন অভিযোগ ওঠে নাই

গণতান্ত্রিক নিয়ম নিষ্ঠা, নীতিবাদ ও ব্যক্তিচরিত্রের পটভূমিকায় আমাদের নিজেদের গণতন্ত্রের কথা ভাবিতেও ইচ্ছা করেনা। নীতিবোধের সঞ্চয় আমাদের কম ছিল না, ব্যক্তি চরিত্রে আদর্শানুগত্যের সম্পদেরই কি অভাব ছিল? ওয়াশিংটন আব্রাহম্ লেংকনের মত নিষ্ঠাবান কর্ম্মী পুরুষ কি এদেশে জন্মে নাই? এখন সে প্রশ্ন তুলিয়া লাভ নাই। আজ আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে অভিযোগকারীকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বিচারের কণ্ঠরোধ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তির এমন আত্ম বিশ্বাস নাই যে বিচারের সম্মুখীন হইয়া নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিবে। ইচ্ছা নাই, প্রবৃত্তি নাই, সৎসাহস নাই রাষ্ট্রচরিত্রে বা ব্যক্তিচরিত্রে। গণতন্ত্রের নামে এ যেন ছেলে পাড়ার সং অথবা গাজনের মিছিল। কখনও কখনও দেবতার নাম উচ্চারণের মত রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, নেতাজী প্রভৃতি নাম উচ্চারিত হয় বটে তবে ইহা সেই সকল পূর্বগামীদের দুর্ভাগ্যের স্মারক। দুর্ভাগা ইহাই যে তাঁহারা এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তর সাধক হিসাবে যাঁহারা তাহাদের নাম উচ্চারণ করিতেছে তাহারা সেই পূর্বগামীদের স্মৃতিকে লজ্জা দিতেছে মাত্র। ইহাকেই বোধ হয় বলা যায় স্মৃতির বিড়ম্বনা।

——

Freedom Fighters whose Pension has been sanctioned

LIST—62 (from 7747—7827)

Dist—24-PARGS

Name	Address	(Amount per month in Rs.)
Sri Ajit kr. Talukdar	Prafullanagar	200
Smt Renu prova Choudhury w/o Sri. Santi Bhusan	29, Ashok Row	200
Sri Amulya ratan Mukherjee	477/2, Ashokenagar	200
,, Ananta lal Seal	Subhaspore	200
Smt Asharani Sarkar, w/o L. Kalipada	Kalyani nagar	200
Sri Amal Kanti Goswami	35, Raighat Rd.	200
Atul ch. Das	676/11, Kalyanghar	200
Atul Gobinda Sarkar	186/1, Ashokenagar	200
,, Adhir Kr. Bhattacharjee	420/1, Ashokenagar	200
Smt Ashalata Banik, w/o Santosh ch.	77/1,	200
Sri Anil krishna Saha	424/3,	200
Abhoy kr. Banerjee	Bongaon	200
Bishnupada Ghosh	Chhayani	200

Name	Address	Rs.
Smt Lila Sen Gupta, w/o L. Bidhu bhusan.	Rajpukur path	100
Sri Debendra nath Bhattacharya	Ashrampara	200
,, Ganesh Ch. Dey Roy	Dinesh pally	200
Smt. Amiya Sengupta, w/o L Tamonash.	19, G. B. East Rd.	100
Sri Haripada Basak	Pratapgarh	200
Anil Kr. Mitra	A/60, Lakshmi Nagar Cal-29	200
,, Kanai lal Mukherjee	14, R. C. Le.	200
Miss Puspa Chakraborty D/o L. Jitendra nath	328, New Govt. Cy.	100
	Dist—HOOGHLY	
Sri Animesh Ch. Roy	188, Bartala Le.	200
Amarendra nath Dutta	55, G. T. Rd.	200
Arun Ch. Roy	Goaltuli Rd.	200
Brindaban Samanta	Raghunathpur	200
Bepin behari Dutta	Fului	200
,, Benoy bhusan Mukherjee	Deora	200
Smt Binapani Mukherjee, w/o L. Kali Ch.	10, H. M. Le.	100
Sri Bibhuti bhusan Roy	Raypara	200
Bimalendu Guha	Viveknagare S. Rd.	200
,, Brojendra nath Bhadra	4/C, D. C. Le.	200
Sri Benoyendra natn Bandyopadhyay	14. S. C. Rd.	200
Biswa nath Banerjee	29, S. C. M. Rd.	200
Chandi charan Meta	Gujrat	200
Dilip Kr. Barman	Bhanderhati	200
Dasharath Banerjee	Nabagram	200
,, Dinabandhu Chatterjee	Uttarpara	200
Durga pada ,,	215, Poarabagan Rd.	200
Fani Bhusan Chakravarty	15/A, Kharir B. Le.	200
Girindra Ch. Roy	Keota Cy.	200
Gostha Behari De	Baradongal	200
Gour Maity	Mahisgote	200
Hiralal Chanda	Baikanthapur	200
,, Harendra Chakraborty	12A, K. B. Le.	200
,, Hiranmoy Ganguly	Satgopepara Le.	200
,, Haripada Bhadury	Chandannagar	200
,, Indu bhusan Chakraborty	80E, D. J. Rd.	200
,, Tirtha basi Ghosal	Aindanga	200
Smt Kshantabala Koley, w/o L. Narayan Ch.,	Salalpur	100
,, Kiran Sashi Nag w/o L. Jnanada prosad Nag	110, R. B. S Town.	

Name	Address	Rs
l Kali Charan Majee	Singur	200
Kumud Behari Chakraborty	82, Bijoy Krishna St.	200
Ketaki ranjan Deb	51, High St.	200
Lalit Mohon Mondal	Arandi	200
ıt Latika rani Raha, w/o L. Debesh	R. Govt. Cy.	150
i Lakshman Ch. Guchhait	Dhanyaghori	200
:t Labannyamoyee Sinha w/o L. Joygopal Sinha	Boinchigram	100
i Mahendra nath Mallik	Niranjanbari	200
Monoranjan Das	296/1, Ward, Mahesh	200
Nagendra mohan Saha	40, R. M. Saha Rd.	200
Nanilal Chakraborty	Roy bazar	200
Jani Gopal Majumder	105, S. C. C. St.	200
Purna Ch. Mandal	Bhanderhati	200
Pannalal Karmakar	374, Bhadrakali	200
Phani bhusan Saha	40, B. M. Saha Rd.	200
Paresh ch. Paul	Bartajpur	200
Priya nath Bose	2/A, P. C. M. St.	200
i Rampada Samanta	Dongal	200
Pijush kanti Shome	B. Telinipara	200
Ratan ch. Maity	Shampur	200
Rebati mohan Sarker	115, R. B. Avenue	200
Radhika prosad Manna	Kumirmorah	200
ıt Renukana Chakraborty w/o L. Bhaba ranjan	Subhas nagar	150
Sudhir ranjan Kar Gupta	46, N. K. B. St.	200
Sundari mohan Chatterjee	32, Z. Bye Rd.	200
Sailendra nath Sen	125, Sarada palli	200
ıt Surama Bose w/o Sri Brahamananda Bose	Jejur	200
i Satish Ch. Samanta	Raghunathpur	200
Upendra nath Das	Bandagachi	200

(To be continued.)

C/67

সম্পাদক মণ্ডলী : সর্বশ্রী অমরীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), পরিমল মজুমদার, শান্তি শরণ রায়চৌধুরী।
প্রেস : প্রিন্টিং পাবলিসিটী, ১১৭ নং কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯ হইতে শ্রীমনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক মু
বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় ৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭, (ফোন : ৩৪-১১৯৪) হইতে প্রকাশি
সম্পাদক—বিমল সেনগুপ্ত